তারিখ ... 08 NOV 2017 ...
পৃষ্ঠা ২ ... কলাম ২ ...

কালের কণ্ঠ

শিক্ষার গোড়ায় গলদ

শরীফুল আলম সুমন ▷

রাজধানীর শেরেবাংলানগরে অবস্থিত আবুল বাশার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ২৭৩ জন, শিক্ষক ৯ জন। অর্থাৎ ৩০ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে একজন করে শিক্ষক। এমনিতে দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গড়ে ৫২ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে একজন করে শিক্ষক রয়েছেন। সে তুলনায় এ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীপ্রতি শিক্ষকের সংখ্যা অনেক বেশি। তা সত্ত্বেও গত বছর এ বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ৪২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ ৫ পেয়েছে মাত্র একজন।

সম্প্রতি এক দুপুরে আবুল বাশার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে মোট শিক্ষার্থীর এক-চতুর্থাংশকেও দেখা যায়নি। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, শিক্ষার্থীরা যে যার মতো আসছে, যাচ্ছে। শিক্ষকরাও কিছু বলছেন না। বিদ্যালয়ে রয়েছে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, ল্যাপটপ। কিন্তু তা দিয়ে ক্লাস নেওয়ার মতো তথ্য-প্রযুক্তিতে দক্ষ কোনো শিক্ষক নেই। রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই) থেকে পাঁচ-ছয় কিলোমিটার দূরের একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চিত্র এটি।

ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামলী রাণী মালাকার কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বিদ্যালয়ের ৯০ শতাংশের বেশি শিক্ষার্থী অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল ও অসচেতন পরিবারের। শিক্ষার্থীরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসে না। এ নিয়ে অভিভাবকদেরও কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। এ রকম পরিবারের শিক্ষার্থীদের পড়ালেখায় ভালো করানো এক রকম অসম্ভব। দুই-একজন পড়ালেখায় মনোযোগী হলেও তৃতীয় শ্রেণিতে উঠলেই তারা অন্য বিদ্যালয়ে চলে যায়।'

একই বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক দেবযানী দত্ত বলেন, 'বিদ্যালয়ের বাউন্ডারি নেই, দারোয়ান নেই। ফলে টিফিন পিরিয়ডে শিক্ষার্থীরা পালিয়ে যায়। মাল্টিমিডিয়া-কম্পিউটার থাকলেও তা চালানোর লোক নেই।'

শুধু আবুল বাশার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নয়, পুরো দেশেই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চিত্র একই রকম। ২০১৫ সালের ইউনেসকোর এশিয়া-প্যাসিফিক রিজিওনাল ব্যুরো ফর এডুকেশনের এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার মান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের অভাবেই শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত হচ্ছে না। প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে বাংলাদেশ। প্রশিক্ষিত শিক্ষকের হার মাত্র ৫৮ শতাংশ। অথচ প্রতিবেশী দেশ নেপালে সরকারি প্রাথমিকে প্রশিক্ষিত শিক্ষকের হার ৯০ শতাংশ, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় ৮২ শতাংশ করে, মালদ্বীপে ৭৮ শতাংশ এবং মিয়ানমারে শতভাগ শিক্ষকই প্রশিক্ষিত।

ডিপিই সূত্র জানায়, দেশে এখন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ৬৪ হাজার। এতে পড়ালেখা করছে প্রায় এক কোটি ৯৫ লাখ শিশু। তবে ২০১৩ সালে জাতীয়করণ করা প্রায় ২৬ হাজার বিদ্যালয়ের বেশির ভাগ শিক্ষকের মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কারণ এসব বিদ্যালয় বেসরকারি রেজিস্টার্ড থাকার সময় শিক্ষকদের নিয়োগ দিয়েছে বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদ। তাদের বেশির ভাগই নিয়োগ পেয়েছেন ২০১১ সালের আগে। যখন নারীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার যোগ্যতার শর্ত ছিল মাধ্যমিক পাস আর পুরুষদের ক্ষেত্রে উচ্চ মাধ্যমিক পাস। অভিযোগ রয়েছে, সে সময় পরিচালনা পর্ষদকে টাকা দিয়ে নিয়োগ পেয়েছেন অনেক শিক্ষক। তাঁদের বেশির ভাগেরই প্রশিক্ষণ নেই। প্রাথমিকের চার লাখ শিক্ষকের মধ্যে এই জাতীয়করণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা এক লাখের ওপরে।

গত এপ্রিলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য যাচ্ছিলেন। পথে মহেশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে শিক্ষার্থীদের ভিড় দেখে মন্ত্রী তাঁর গাড়ি থামিয়ে বিদ্যালয়ে যান। তখন সকাল ১১টা ৪০ মিনিট। অথচ কোনো শিক্ষক তখনো বিদ্যালয়ে উপস্থিত হননি। শ্রেণিকক্ষগুলোও ছিল বন্ধ। শিক্ষকদের অপেক্ষায় ছিল শিক্ষার্থীরা। এ অবস্থায় মন্ত্রী উপজেলা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা মাহাতাবুর রহমানকে ফোন করেন। তারও ১০ মিনিট পর ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মমিনুল ইসলাম বিদ্যালয়ে উপস্থিত হন। তখনো অনুপস্থিত ছিলেন দুই সহকারী শিক্ষক সাইদুর রহমান ও রেজাউল ইসলাম।

▶▶ বিশেষ পৃষ্ঠা ৩ ক. ৫

শিক্ষার গোড়ায় গলদ

▶▶ বিশেষ প্রথম পৃষ্ঠার পর

এ সময় মন্ত্রী প্রধান শিক্ষককে ভর্ৎসনা করে নিজেই শিক্ষার্থীদের ক্লাস নেন।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, দেশের বেশির ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয় এভাবেই চলছে। অনেক শিক্ষক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাকরিকে দ্বিতীয় পেশা হিসেবে মনে করেন। তাঁরা বিদ্যালয়ে আসতে এবং শিক্ষার্থীদের পাঠদানে আন্তরিক নন। শিক্ষা কর্মকর্তারাও অনিয়মে জড়িত। তাঁদের পরিদর্শন কার্যক্রমও নড়বড়ে। আগে থেকেই সরকারি ৩৬ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে ২০১৩ সালে যোগ হয়েছে আরো ২৬ হাজার বিদ্যালয়। মোট ৬৪ হাজার বিদ্যালয়ের পৌনে চার লাখ শিক্ষকের মধ্যে দেড় লাখেরই যোগ্যতায় বড় ঘাটতি রয়েছে। বিশেষ করে মান উন্নয়নে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে জাতীয়করণ হওয়া ২৬ হাজার বিদ্যালয়। এগুলোর বেশির ভাগ শিক্ষক এখনো অপ্রশিক্ষিত। সব মিলিয়ে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষার মানে দুর্গতি নেমে এসেছে।

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শিক্ষার মানের উন্নতির প্রথম শর্ত ভালো শিক্ষক। কিন্তু প্রাথমিকের নিয়োগে দুর্নীতি, পক্ষপাতিত্ব আছে। যাঁদের শিক্ষক হওয়ার কথা নয়, তাঁরা অন্য কোনো চাকরি না পেয়ে প্রাথমিকে আসছেন। কিন্তু মাধ্যমিকের চাইতেও প্রাথমিকের শিক্ষকতা কঠিন। শিশুরা স্পর্শকাতর ও কোমলমতি। তাই প্রাথমিকের শিক্ষকদের দায়িত্বটা অনেক বেশি। প্রাথমিকের শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ব্রিটিশ আমলে যেটা ছিল সেটাও এখন নেই। চাকরি পেলেই শিক্ষক হয়ে যান। শিক্ষকদের পুনঃপ্রশিক্ষণ হয় না, যা খুবই দরকার। বিত্তবানরা কিন্ডারগার্টেন অথবা উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিকে বাচ্চাদের ভর্তি করে। ফলে আলাদা প্রাথমিকগুলো সব সময়ই উপেক্ষিত থাকে। এখন মাদরাসার ব্যাপারে সবার মধ্যে যতটুকু আগ্রহ দেখা যায়, সরকারি প্রাথমিকের প্রতি আগ্রহ এর চেয়েও কম।'

জানা যায়, শিক্ষার তিনটি স্তরের মধ্যে সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারীরাই আসছেন প্রাথমিকের শিক্ষকতায়। এমনকি প্রাথমিক শিক্ষকদের বেশির ভাগই অন্য কোনো চাকরির সুযোগ না পেয়ে শেষে আসেন এই পেশায়। আর মর্যাদার দিক দিয়ে সহকারী শিক্ষকরা এখনো প্রজাতন্ত্রের তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী। ফলে মেধাবীরা প্রাথমিকের শিক্ষক হিসেবে আসছেন না। প্রাথমিকের শিক্ষকের প্রশিক্ষণের সুযোগও খুব কম। শিক্ষকদের দক্ষতার অভাবেই শিক্ষার্থীরা দুর্বলতা নিয়ে শিক্ষাজীবনের প্রথম ধাপ পার করছে। দেশের শিশুদের একটি বড় অংশ কিন্ডারগার্টেনে পড়লেও এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের মান সবচেয়ে নিচে। ফলে প্রাথমিকে বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থী বাড়লেও বাড়ছে না শিক্ষার মান।

শিক্ষাবিদরা বলেছেন, শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি নির্ভ করে শিক্ষকদের ওপর। এখন শিক্ষকদের মানই যা প্রশ্নবিদ্ধ হয় তাহলে শিক্ষার মানও বাড়বে না শিক্ষকদের দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ না থাকলে তাঁ শ্রেণিকক্ষের পাঠদানের মান নিশ্চিত করতে পারবে না। সরকারের অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, উপবৃ প্রদান, বিনা মূল্যের বই প্রদানসহ নানা পদক্ষেপে ফলে শতভাগ শিশুই বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। ঝরে পড় হারও ২০ শতাংশে নেমে এসেছে। অথচ দ শিক্ষকের অভাবে গুণগত মান নিশ্চিত করা সম্ভ হচ্ছে না। আর বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষকদের ম বাড়াতে শিক্ষাগত যোগ্যতা উন্নীত করতে হবে।

গত বছর প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষকদের হতাশার চিত্র ফু উঠেছে। রিচার্স ফর অ্যাডভান্সমেন্ট অব কর্মর এডুকেশনের (রেস) প্রকাশিত জরিপে বলা হ প্রাথমিকে ১৩ শতাংশ শিক্ষক পুরোপুরি সৃজনশীল যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন বোঝেন না। ৪২ শতাংশ সীমি পরিসরে নিজেরা বুঝলেও ক্লাসে বোঝাতে পারেন ন বাকি ৪৫ শতাংশ বোঝেন। সৃজনশীল না বোঝায় ৪ শতাংশ শিক্ষক বাজারের গাইড বইয়ের ওপর নির্ভ করেন। ৩৫ শতাংশ সহকর্মীর সঙ্গে আলোচনা করে এবং বাকি ১৮ শতাংশ নিজেদের ধ্যান-ধারণা থে পড়ান।

প্রাথমিকের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ বলতে গেলে জীব একবারই, সেই ফাউন্ডেশন ট্রেনিং। কিন্তু ওই প্রশিক্ষ কতটুকু কাজে লাগছে তা সরকারের পক্ষ থেকে যাচ করা হয় না। একবার প্রশিক্ষণ নিলেই একজ শিক্ষককে প্রশিক্ষিত বলা যাবে কি না তা নিয়ে সন্দিহান সংশ্লিষ্টরা। ২০১৫ সালের এডুকেশন ওয় রিপোর্টেও ধরা পড়েছে শিক্ষকদের যোগ্যতা প্রশিক্ষণের ঘাটতি। তাতে বলা হয়েছে, ১৯৯৮ সা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্নাতক ডিগ্রিধারী শিক্ষকের সং ছিল ৪৮.৩ শতাংশ, ২০১৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়ে ৫৭.২ শতাংশে। তবে নতুন জাতীয়করণ প্রাথমি বিদ্যালয়ে এই হার মাত্র ২৬.১ শতাংশ, উপানুষ্ঠানি বিদ্যালয়ে মাত্র ৮ শতাংশ এবং এবতেদায়ি মাদরাস শিক্ষকদের বেশির ভাগ মাদরাসাতেই পড়ালে করেছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেশির ভাগ শিক্ষ মানবিক বিভাগে পড়ালেখা করেছেন। ২০১৪ স পর্যন্ত মৌলিক প্রশিক্ষণ (সিইনএড, বিএড, এমএ ছিল ৬৫.৯ শতাংশ শিক্ষকের। প্রশিক্ষণের গুরু ঘাটতি লক্ষ করা গেছে কিন্ডারগার্টেন ও এবতেদ মাদরাসায়। যাদের হার যথাক্রমে ১৫ ও ৭ শতাং ২০১৪ সালে শিক্ষকদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হ ৮৯.৩ শতাংশ এবং যথাসময়ে উপস্থিতির হার ৬৮